প্রথম অধ্যায়

বৈশ্বিক মন্দা উত্তরণকালে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা

ভূমিকা

১.১ বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের পর ভয়াবহতম আর্থিক মন্দা মোকাবেলা করে বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রম-উত্তরণ শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন বাজারে সৃষ্ট বুদবুদ ২০০৬ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। পরবর্তীতে এর পতন হলে গৃহায়ন খাতে ধ্বস নামে যা অতি দ্রুত সমগ্র আর্থিক খাতে সংকটের সৃষ্টি করে। প্রাথমিকভাবে উন্নত দেশসমূহের আর্থিক খাতই এ সংকটের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু অতিদ্রুতই তা উদীয়মান দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সংকটের বিস্তারের সাথে সাথে নীতি নির্ধারকরা সম্প্রসারণশীল মুদ্রানীতি ও রাজস্ব প্রণোদনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ পিটসবার্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জি-২০ নেতৃবৃন্দ বিশ্বমন্দা দূরীকরণে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১.২ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১০ সালে বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ৪.২ শতাংশ হবে বলে আশা করা যায়। ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে একই সংস্থার প্রক্ষেপণে যা ছিল ৩.১ শতাংশ। অনেক উন্নত দেশই মন্দাবস্থা থেকে আশানুরূপ উত্তরণ লাভ করতে পারেনি। তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অনেক উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অধিক গতিশীল ছিল। যেসব দেশে এখনো বৈশ্বিক মন্দা হতে উত্তরণ স্থায়ী রূপলাভ করেনি, সেখানে বৈশ্বিক চাহিদার পুনঃভারসাম্য সহায়ক নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলোর অর্থনীতি উন্নত দেশগুলো থেকে অনেক ভাল করেছে এবং ২০০৯ সালে ৬.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা কমার প্রেক্ষিতে ২০১০ সালে উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ৮.৭ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস করেছে।

বৈশ্বিক মন্দা

১.৩ ২০০৭ সালে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও খাদ্য, সার ও জ্বালানি তেলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। অধিকন্তু, ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে সাইক্লোন 'সিডর' ও ২০০৯ সালে সাইক্লোন 'আইলা' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সরকারের গৃহীত সময়োচিত পদক্ষেপ ও বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেল, সার ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের ফলে ২০০৮ সালে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস পায়। তবে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্তরে উর্ধ্বমুখী প্রবণতার ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, রেমিট্যান্স প্রবাহ ও বৈদেশিক সহায়তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব

১.৪ বৈশ্বিক মন্দার শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে, বিশেষত রপ্তানিতে এর নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হয়েছে।

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের ১৫.৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ১০.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১.০ শতাংশ।
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৪.১ শতাংশ যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ২৬.১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি (-১.৫) হয়েছে।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজারে ধ্বস নামলেও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিদেশী বিনিয়োগের স্বল্প (প্রায় ২.৫ শতাংশ) সংশ্লিষ্টতা থাকায় সেখানে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বরং উক্ত সময়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তেজিভাব লক্ষ্য করা গেছে।

- বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আবাসন শিল্পে ধ্বস নামা এবং মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে শ্রমিকদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ হতে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পায়। একই সময়ে লিবিয়াসহ কয়েকটি নতুন দেশে শ্রমবাজার উন্মোচিত হওয়ায় সার্বিক রেমিট্যান্স প্রবাহে তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। ফলে মন্দা সত্ত্বেও ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে ১৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

মন্দা মোকাবেলার নীতি কৌশল

১.৫ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য ৩৪২৪ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষণা করা হয়। এ প্যাকেজে নির্দিষ্ট কিছু রপ্তানিমুখী শিল্পে ২.৫ শতাংশ নগদ সহায়তা বৃদ্ধি, রপ্তানি সহায়তার ৭০ শতাংশের তাৎক্ষণিক ছাড়, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি, রপ্তানি ঋণের উর্ধ্বসীমা সম্প্রসারণ, ঋণের সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।

বক্স ১.১

দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্বমন্দা পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলা করার জন্য গঠিত টাস্কফোর্স ও রপ্তানি খাতের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে সরকার রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য নভেম্বর ২০০৯-এ দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য প্রথম ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ এবং এর সংশোধিত প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুবিধা/সহায়তার প্রস্তাব নিম্নরূপঃ

- নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার (আমেরিকা, কানাডা ও ইইউ ব্যতীত) প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের (এফওবি) ওপর বর্ধিত প্রণোদনা
- 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি' বস্ত্রশিল্পের (২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত) জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা
- 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি' বস্ত্রশিল্পের যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কেপটিভ জেনারেটর নেই চলতি অর্থবছরে তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান, যা ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বলবৎ থাকা
- Export Development Fund হতে একক ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উন্নীত করে ৩ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং Crust Leather শিল্পে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা

১.৬ দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজে পোষাক শিল্প খাতে নতুন বাজার অন্বেষণ ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাহাজ নির্মাণ ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারের ত্বরিত সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগত কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবের প্রশমন সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তিও এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি

১.৭ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ-

- বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কাছাকাছি রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এসময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় ছিল এবং মূল্যস্ফীতি ব্যাপক সৃষ্টি হয়নি। কৃষি খাতের ধারাবাহিক অর্জন জিডিপি'র এ প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত রয়েছে। এর ফলে আছে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে যা কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করছে।
- সাধারণত বাংলাদেশ হতে স্বল্প মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। ফলে মন্দার কারনে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদার ওপর তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি;
- বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিদেশে নিম্ন আয়ের পেশায় নিয়োজিত থাকায় মন্দাকালে তাদের ব্যাপক ছাঁটাই হয়নি;
- বাংলাদেশ রপ্তানি পণ্যের বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে ২য় প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ, জাপানে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও কয়েকটি নতুন দেশে রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমুখীকরণ সাফল্য এসব প্রণোদনার ফলশ্রুতি বলা যায়;
- বাংলাদেশ রপ্তানি পণ্যের মান নির্ধারণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে। সরকারের পাশাপাশি হিমায়িত খাদ্য ব্যবসায়ী সমিতির মত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোও এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

১.৮ বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে বেশ কিছু উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত **'রূপকল্প ২০২১'** ঘোষণা করেছে যাতে দেশের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

সারণি ১.১: বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

ক্রমিক নং	লক্ষ্য	২০২১ সালের টার্গেট
১.	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১০% (২০১৭ সাল)
২.	দারিদ্র্য সীমা	১৫%
৩.	বেকারত্বের হার	১৫%
৪.	জিডিপিতে কৃষির অবদান	১৫%
৫.	জিডিপিতে শিল্পের অবদান	৪০%
৬.	জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান	৪৫%
৭.	গড় আয়ুষ্কাল	৭০ বছর
৮.	শিশু মৃত্যুর হার	১৫ (হাজারে)
৯.	মাতৃ মৃত্যুর হার	১.৫%
১০.	জন্ম নিয়ন্ত্রণ সুবিধা গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮০%
১১.	জনসংখ্যা	১৬৫ মিলিয়ন

উৎসঃ ভিশন ২০২১

১.৯ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৮ শতাংশে উন্নীত হবে ও ২০১৭ সালে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে পরবর্তীতে তা চলমান থাকবে। ২০২১ সালে জনসংখ্যা ১৬৫ মিলিয়ন ও শ্রম শক্তি ১০৫ মিলিয়ন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সরকার মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশের কর্মসংস্থানের জন্য

বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সরকার শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে নয়, বরং দারিদ্র্য নির্মূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাতে করে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা যায়। ২০২১ সালে দারিদ্রের হারকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত হত দরিদ্রের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।

১.১০ খাদ্য ঘাটতি দূর করে ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা হবে। এর মাধ্যমে মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য ২১২২ কিলোক্যালরী খাদ্য, সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা হবে। গড় আয়ুষ্কাল ৭০ বছর এ বৃদ্ধি এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নীট ভর্তির হার ২০১০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরী, স্নাতক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষকদের উচ্চ বেতন প্রদান সরকারের অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি

১.১১ বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসন ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে (সারণি ১.২)। ১৯৯২ সালে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ২৭৭ মার্কিন ডলার যা ২০০৯ সালে ৬৮০ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ সালের মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার (Head Count Ratio) ৫৮.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের অভিঘাতের নিরিখে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এখনো বড় ধরনের ব্যবধান বিরাজ করছে। যদিও শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের মাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আয়-বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রবৃদ্ধির সুফল সঞ্চালন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। জিনি সহগের (Gini co-efficient) মান ১৯৯১ সালের ০.৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ০.৪৭-এ দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে ১.৪৭ শতাংশ আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালের পর সিডর ও আইলার মত প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ততটা উন্নতি ঘটেনি।

বক্স ২

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অভিঘাতের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী ও গবেষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ২০০৭ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইলা ও সিডরের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে মর্মে বিশ্বব্যাংক তাদের স্টাডিতে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের স্টাডিতে দেখিয়েছে যে, যেখানে দেশের কেন্দ্র, বিশেষ করে ঢাকা ও এর আশেপাশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের জীবন মান উন্নত হয়েছে, সেখানে দক্ষিণাঞ্চলের শতকরা ২০ ভাগ লোকের জীবন মান উন্নত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সিডর ও আইলার আঘাতের কারণে এটি ঘটেছে।

সারণি ১.২: সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

বিবরণ	ভিত্তি বছর	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫
লক্ষ্যমাত্রা- ১ঃ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল			
• দ্রারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানকারী জনসংখার শতকরা অংশ (২১২২ কিলো ক্যালরী)	৫৮.৮% (১৯৯১)	৪০.০% (২০০৫)	২৯.০%
• দারিদ্র্য ব্যবধানের অনুপাত	১৭.২ (১৯৯০)	৯.০ (২০০৫)	৮.০
• পাঁচ বছরের নিচে কম ওজনের শিশুর হার (শতাংশ)	৬৭.০% (১৯৯০)	৩৯.৭% (২০০৫)	৩৩.০%

বিবরণ	ভিত্তি বছর	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫
লক্ষ্যমাত্রা- ২ঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন			
• প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার (শতাংশ)	৬০.৫% (১৯৯০)	৯১.১% (২০০৭)	১০০%
• প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার (শতাংশ)	৪০.০% (১৯৯০)	৭৯.৮% (২০০৯)	১০০%
• বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫ বছরের উর্ধ্বে)	৩৫.৩ (১৯৯১)	৫৯.১% (২০০৮)	১০০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৩ঃ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উদ্বুদ্ধকরণ			
• প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের নীট ভর্তি হার (শতাংশ)	৫০.৮% (১৯৯০)	৯৪.৭% (২০০৭)	১০০%
ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত			
প্রাথমিক শিক্ষা	১০০:৮৩ (১৯৯০)	১০০:১০৩ (২০০৯)	১০০:১০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০:৫২ (১৯৯০)	১০০:১১৭ (২০০৯)	
উচ্চ শিক্ষা	১০০:৩৭ (১৯৯০)	১০০:৬১ (২০০৭)	
• অ-কৃষি খাতে কর্মজীবী মহিলাদের মোট অংশ (শতাংশ)	১৯.১% (১৯৯০)	১৪.৬% (২০০৫)	৫০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৪ঃ			
• পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি দশ হাজার জীবিত জন্মে)	১৪৬ (১৯৯০)	৬৭ (২০০৯)	৪৮
• শিশু (০-১ বছর) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৯২ (১৯৯০)	৪৫ (২০০৯)	৩১
লক্ষ্যমাত্রা- ৫ঃ মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন			
• মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৫৭৪ (১৯৯০)	৩৪৮ (২০০৮)	১৪৪
• দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তত্বাবধানে জন্মে নেয়া শিশুর অনুপাত	৫.০% (১৯৯০)	২৪.৪% (২০০৯)	৫০.০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৬: ঃ এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ			
• সরাসরি পর্যবেক্ষণকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় যক্ষা উদঘাটনের শতকরা হার	২১% (১৯৯০)	৭৩% (২০০৭)	১০০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৭: টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ			
• মোট আয়তনে বনভুমির অংশ (শতাংশ)	৯.০% (১৯৯০)	১০.০% (২০০৭)	২০.০%
• উন্নত পানির উৎসের নিশ্চয়তা আছে এমন জনসংখ্যার শতকরা হার	৮৯.০%	৯৭.৮(২০০৯)	১০০
• কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গমণ, মাথাপিছু মেট্রিক টনে	০.১৪ (১৯৯০)	০.৩ (২০০৭)	প্রযোজ্য নয়

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১.১২ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার ১৯৯০ সালের ৬০.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালে ৯১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা (gender parity) অর্জিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পিইডিপি-২ (Primary Education Development Program-II) এর সফল বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। একটি

যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ২৪টি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত ‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০’ সরকার ইতোমধ্যে অনুমোদন করেছে।

১.১৩ শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের প্রতি ১০০ জন জীবিত শিশুর মধ্যে ৯৪ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৭ সালে ৪০ এ দাঁড়িয়েছে। ইউএনডিপি’র মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৫ সালের ৪৫২ থেকে বেড়ে ২০০৭ সালে ৫৪৩-এ পৌঁছেছে। গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৬৫.৪ বছরে (পুরুষ-৫৪.৪ বছর ও নারী ৬৬.০ বছর) দাঁড়িয়েছে। ৯৭.৮ শতাংশের অধিক মানুষের নিরাপদ খাবার পানি এবং প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের উন্নত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে অধিকাংশ গ্রামের দূরবর্তীতার (remoteness) অভিশাপ মোচন হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ইউএনডিপি-র সূচকে বাংলাদেশ মধ্যম মানের মানব সম্পদ উন্নয়ন গ্রুপে উন্নীত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহ

মন্দাত্তোরকালে অর্থনৈতিক গতিশীলতা

১.১৪ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে। এ প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ এ ৬.৭ শতাংশ ও ২০১১-১২ এ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৮.০ শতাংশ যা রূপকল্প ২০২১-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা

১.১৫ ২০১৩ সালের মধ্যে ৮৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ৮৩০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট ও ১,০১৫-১,২১৫ মেগাওয়াট ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদকদের (Independent Power Producer) মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বর্তমানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুতের ব্যবহার যৌক্তিক করার লক্ষ্যে সরকার গতানুগতিক বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অবকাঠামো সৃষ্টি

১.১৬ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলা পর্যায়ে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কার্যালয়গুলো ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স এর অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে 'Access to Information Technology' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১০ সালের জুন মাসের মধ্যে সরকার সচিবালয়ে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে 'Field Administration Coordination Program Through Video Conferencing' নামে একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি হবে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল সুবিধার আওতায় আনা হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

১.১৭ সরকার তার দুর্নীতি বিরোধী নির্বাচনী অঙ্গিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্নীতি হ্রাসে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও জনমনে আস্থা তৈরীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় দুর্নীতি বিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ধিত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তদন্ত কাজে অধিক কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে । দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর করা হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদের সবকটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিসমূহ কয়েকটি বিশেষ কর্তৃপক্ষ/দপ্তরের সরকারি দায়িত্ব পালনে সংগঠিত অনিয়ম/দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

১.১৮ সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং জটিল কাজ। চলতি অর্থবছরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যথা- অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে টেন্ডার দাখিল, যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট প্রবর্তন, একদিনে চেক নিষ্পত্তির জন্য MICR (Magnetic Ink Character Recognition) চেক এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া সুশাসনের জন্য আরও যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো- (১) সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করা (২) জন প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ (৩) দরিদ্র ও মহিলা জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার (৪) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকার পরিবর্তন (৫) স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ (৬) ই-গভর্নেন্স (e-governance) ব্যবস্থার প্রসার (৭) দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (৮) মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ (৯) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ (১০) প্রকল্প বাস্তবায়ন সামর্থ্যের বিকাশ এবং (১১) বিভিন্ন খাতে সুশাসনের বিস্তার।

দারিদ্র্য ও অসমতা নিরসনে প্রচেষ্টা শক্তিশালীকরণ

১.১৯ **সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যয়:** বয়স্ক ভাতা, বিধবা, পরিত্যক্তা ও অসহায় মহিলাদের ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যয়ের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা প্রদান এবং মৌসুমি বেকারত্বের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচিসহ জাতীয় নতুন নতুন নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২০ **দারিদ্র্য হ্রাস ও নারীর অগ্রগতিতে ব্যয়ঃ** মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে নির্ণিত দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাসের ধারায় দেশের দারিদ্র্যের মাত্রা ১৯৯১-৯২ সালের ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ৪৯.৮ শতাংশে নেমে আসে। উক্ত সময়ে প্রতিবছরে যৌগিক হিসাবে ১.৮ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এসময়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার উচ্চতর ছিল (বাৎসরিক যৌগিক হার ২.২ শতাংশ) অপরদিকে ২০০০-২০০৫ মেয়াদে দারিদ্র্য ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে আসায় বছরে গড়ে ৩.৯ শতাংশ হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে উচ্চতর হার দেখা গেছে (বাৎসরিক ৪.২ শতাংশ)। এটা লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০০ সাল মেয়াদে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি ছিল।

১.২১ চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের সম্প্রসারণের জন্য উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এ বরাদ্দ চলতি বছরের মোট বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ ও জাতীয় আয়ের প্রায় ৯.৯৫ শতাংশ।

১.২২ রূপকল্পে ঘোষিত দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত দারিদ্র্য বিমোচনমুখী নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দরিদ্র জনগোষ্ঠির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দের গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দকরণের ফলে কর্মসূচিভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিকট সম্পদের ওপর সত্ব অর্জনের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায়ন ও চেতনার বিকাশ ঘটবে
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমেও দরিদ্র শ্রেণীর কর্মসৃজন হচ্ছে
- শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, উপ-বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা এবং বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কর্মসূচির ফলে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যয় সরাসরি হ্রাস পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তা মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.২৩ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আচরণ দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। নারীর উন্নয়ন একটি আন্তঃখাত সম্পর্কিত বিষয় যা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই বিরাজমান। বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন এবং জন প্রশাসনে যোগদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ অগ্রগতি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

১.২৪ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে বাজেট বরাদ্দ কীভাবে ও কী পরিমাণে নারী উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে তা উল্লেখ করতে হয়। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৩০ শতাংশ নারী উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং এটি জিডিপির প্রায় ৪.৯৩ শতাংশ। বাজেটে নারী উন্নয়নের জন্য বর্ধিত সম্পদের যোগানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সারণি ১.৩: বিভিন্ন বছরের বাজেটে কর্মসূচিভুক্ত ব্যয়ের অংশ

ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ	মোট কর্মসূচি ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের শতাংশ		
	২০০৭-০৮ সংশোধিত	২০০৮-০৯ সংশোধিত	২০০৮-০৯ সংশোধিত
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	১৪.৭	১৫.০	১৫.০
দারিদ্র্য হ্রাসমূলক	৫৮.৩	৫৯.৬	৬০.১
নারীর অগ্রগতি ও অধিকার	২৫.৬	২৯.৭	২৯.৭

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

১.২৫ বিশ্ব মন্দার পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় দেশসমূহ তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক চাপ মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির গতি সচল রাখার অন্যতম কৌশল হচ্ছে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া। মন্দা মোকাবেলায় সরকারের দুই পর্যায়ে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। মন্দা মোকাবেলায় সরকারের সজাগ ভূমিকা ও কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন খাতে মন্দার ক্ষতির প্রকোপ লাঘবে সহায়ক হয়েছে। চলতি অর্থবছরে দেশে উন্নয়ন খাতে রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সুবাদে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, যা চুড়ান্তভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রসার ঘটাবে। উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের বিপুল বিনিয়োগের ধারা পরবর্তী বছরসমূহেও অব্যাহত থাকবে। সরকার অবকাঠামো খাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প যথা- পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকায় উড়াল এক্সপ্রেস পথ নির্মাণ এবং পিপিপি উদ্যোগে গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি উড়াল পথ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। প্রবাসী আয়ের সিংহভাগ গৃহস্থালী কাজে ব্যয় হয়। ফলে প্রবাসি আয়ের অব্যাহত প্রবাহ স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা চাঙ্গা রাখবে।

১.২৬ রূপকল্প অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৮ শতাংশে অর্জনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে ব্যক্তি খাত(Private Sector)। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তি খাতনির্ভর শিল্পনীতি ২০১০ এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়া শিল্পনীতি ২০১০ এর কিছু উল্লেখযোগ্য কৌশল হলোঃ

- কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শ্রমঘন শিল্পে প্রাধিকারের ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে শিল্পায়ন
- শিল্পায়নের লক্ষ্যে সীমিত ও নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও খরচ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা সম্মলিত এক কেন্দ্র সেবা (One Stop Service)
- নতুন শিল্প স্থাপনে জমির সংগ্রহে পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদান

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বন্দর সুবিধা, রেল ও সড়ক পরিবহন এবং টেলিযোগাযোগ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ
- শিল্পায়নে, দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের চাহিদাপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং খাত ও সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ
- শিল্প ঋণ গ্রহীতাদের নিকট পরিচালনা তহবিল যোগানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান অর্থায়ন সুবিধা যথা- সমমূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল (ইইএফ) পূণর্গঠন
- সিকিউরিটি এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)-এর কার্যক্রম সংহত ও শক্তিশালীকরণ
- ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো এবং কুটির শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকে সহায়তা
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন

১.২৭ শিল্প উৎসাহিত করার লক্ষ্যে খসড়া শিল্পনীতি ২০১০ এ প্রস্তাবিত কতিপয় বিশেষ প্রণোদনা নিম্নরূপঃ

- উত্তারাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ও অনুন্নত এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা (বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর জেলাসমূহ)
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে (তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতিত) শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে অর্জনকৃত আয়ের ওপর প্রথম ২ বছরে শতভাগ কর অবকাশ, পরবর্তী ২ বছর ৫০ শতাংশ কর অবকাশ এবং পরবর্তী ১ বছর অর্থাৎ ৫ম বছরে ২৫ শতাংশ কর অবকাশ সুবিধা
- রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় শিল্প স্থাপনে মোট ৭ বছরের কর অবকাশ সুবিধা দেয়া। এতে প্রথম তিন বছরে শতভাগ, পরবর্তী তিন বছরে ৫০ শতাংশ এবং সর্বশেষ ১ বছর অর্থাৎ ৭ম বছরে ২৫ শতাংশ কর অবকাশ সুবিধা
- কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যর্থ হলে আবেদন অনুমোদিত মর্মে গণ্য করা
- বিনিয়োগকারীর বক্তব্য জানা ব্যতিরেকে কোন কর অবকাশ আবেদন বাতিল না করা
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর ধার্য শুল্ক হারের চেয়ে একই পণ্যের আমদানির উচ্চতর শুল্ক ও আয়কর হার নির্ধারণ
- অনিবাসী বাংলাদেশীগণের বিনিয়োগকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) হিসেবে গণ্য করা এবং অনিবাসী বিনিয়োগকারীরগণ বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের সমরূপ সুবিধা
- বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের বিনিয়োগকৃত মূলধনের সম্পূর্ণ প্রত্যাবসন অনুমোদন
- মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলসমূহে শিল্প কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা

১.২৮ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সার্বভৌম ঋণ মান (Soverign Credit Rating) অর্জন করেছে যা সন্তোষজনক। দুটি আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান যথা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Moody's Investor Service এবং সিংগাপুরভিত্তিক Standard & Poor's কর্তৃক নির্ধারিত ২টি পৃথক মূল্যায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার সমপর্যায়ের। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ওপরে আছে। ঋণমানের এ মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থায়ন ও লেনদেনের ভারসাম্য বিবেচনায় ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস ও দেশের অর্থনীতি সংকট মোকাবেলার সক্ষমতা প্রমাণ করে। এ ঋণমান অর্জনের ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পুঁজির প্রাপ্তি সহজ হবে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। এটি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ

১.২৯ বর্তমান সরকার জনজীবনের দুর্ভোগ লাঘবের নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, নিরাপদ ও সহজপ্রাপ্য পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না। তাই সরকার ২০০৯ সাল থেকে অংশীদারিত্বভিত্তিক সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে।

১.৩০ ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপির জন্য ২৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এ বরাদ্দের ফলে দেশে বিদেশে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরী হয়েছে। পিপিপি উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল এবং কাঠামো গড়ে তোলার নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি পিপিপি কৌশল অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে যাতে পৃথক পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। নতুন কৌশল অনুযায়ী একটি নিবেদিত পিপিপি সেল গঠন করা হচ্ছে যা পিপিপি উদ্যোগের প্রক্রিয়াকরণের মূল সত্তা হিসেবে কাজ করবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অন্তত দু'টি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প পিপিপি উদ্যোগে গ্রহণের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে। ঢাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প পিপিপির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, পরবর্তী বছরসমূহে পিপিপি উদ্যোগে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকার বিদ্যমান অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করা সম্ভব হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণ

১.৩১ বাংলাদেশের দুটি অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তার মধ্যে (১) দক্ষিণাঞ্চলে সাগরের কাছে নদীগর্ভ ও পানির স্তর উচু হওয়ায় নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে। নদীর পানির প্রবাহ হ্রাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। এগুলোর ফলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুরুতর আকার ধারণ করে ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি করবে এবং (২) অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে স্বল্প বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার প্রভাবে পানির অপ্রতুলতার কারণে মরুকরণ ও শুস্ক অবস্থা বিরাজ করবে।

১.৩২ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য ২০০৯ সালে জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০০৯ সালের বালি ঘোষণায় (Bali Declaration)জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ৪টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষেত্র ৪টি হল: অভিযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষতি উপশম এবং সময়মত বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সামগ্রিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি এবং সুযোগসমূহ সমন্বয় করার কৌশল নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৭০০ কোটি টাকায় একটি জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি ২০০৯ (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan) এর ভিত্তিতে গ্রহণকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ তহবিলের সম্পদ ব্যবহার করা হবে।

আঞ্চলিক/উপাঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধা গ্রহণ

১.৩৩ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাসের পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক/উপাঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসার বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে দক্ষিণ এশিয়ার গড় জাতীয় উৎপাদন শতকরা ২.০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আঞ্চলিক বাজারের বর্ধিত সমন্বয়ের ফলে কোন রকম বাড়তি সরকারি ঘাটতি ছাড়াই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতে পারে।

১.৩৪ আঞ্চলিক বাজারসমূহের বর্ধিত সমন্বয় এবং আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে শুধু প্রবৃদ্ধিই উচ্চতর হবে তা নয়, এটা Inclusive Growth-এর সহায়ক হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে। দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারণে ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়া উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং পূর্ব এশিয়ার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নয়ন অর্জনকারী অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এটি Inclusive Growth নয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা রয়েছে। এ অঞ্চলের বাজারসমূহ সমন্বিত হলে সীমান্তবর্তী

স্থলবেষ্টিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠিসমূহ বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এবং স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেপাল ও ভূটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের জনগোষ্ঠি লাভবান হবে। এদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার সমন্বিতকরণ এবং ট্রানজিটের ব্যবস্থাকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩৫ বিগত ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারত সফরের মাধ্যমে বাণিজ্য ও যোগাযোগের অপরিহার্যতার বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশ ও ভারত উত্তরাঞ্চল সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিষয়কে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মত হয়েছে-

- শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণ
- সংবেদনশীল তালিকাভুক্ত পণ্যের সংখ্যা হ্রাসকরণ
- ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ
- বাংলাদেশ মান ও পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের (BSTI) শক্তিশালীকরণে সহযোগিতা
- স্থলবন্দরসমূহের শক্তিশালীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন
- বন্দর সুবিধা ব্যবহারের বাধা দূর এবং রেল ও নৌপথে যোগাযোগের সুবিধা সম্প্রসারণ
- ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান
- নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য ব্রডগেজ রেলওয়ে সংযোগ স্থাপন
- ভারতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে বাংলাদেশে ২৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ
- ভারত কর্তৃক ১ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহজ শর্তে বাংলাদেশকে প্রদান (৫ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২০ বছরের জন্য ১.৭৫ শতাংশ সুদে)

আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিনিময়ের পথ উন্মোচিত হবে। ফলে নতুন বাজার সৃষ্টি হবে যা কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথকে সুগম করবে। এমনকি আঞ্চলিক বৈরিতার অবসান এবং অবিশ্বাস দূর করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির পথে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা অপসারণে সহায়ক।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংস্কার

১.৩৬ সরকারি অর্থ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। সরকার গৃহীত এসব আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পদক্ষেপসমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

আইনগত সংস্কার

১.৩৭ বাংলাদেশের রাজস্ব নীতি প্রধানত ২০০৯ সালে গৃহীত সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন (২০০৯ সালের ৪০ নং আইন) অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি হলো- বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা, আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এছাড়া-

- অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস এবং উক্ত উৎস হতে সংগৃহীত বার্ষিক ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টিজনিত প্রচ্ছন্ন দায় (contingent liability) ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা; এবং
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণের পরিমাণ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা।

এ আইনটি সম্পদ বন্টনে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সমতা ও সৃচ্ছতা নিশ্চিত গ্রহণ করবে-

- আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিতকরণ
- নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণ
- দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে অধিক বরাদ্দ প্রদান

এ আইনে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে-

- বাজেট বাস্তবায়নে ও পরিবীক্ষণে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একটি বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ বা অধিশাখা বা শাখা প্রতিষ্ঠা করবে
- অর্থমন্ত্রী, বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয়ের গতিধারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করবেন এবং উক্ত পর্যালোচনার ফলাফল এবং করণীয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করবেন।

গত মার্চ ২০১০-এ জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ৬ জুন ২০১০ তারিখে সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

১.৩৮ সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রচলিত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি পরিমার্জন করে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework-MTBF) পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। ক্রমান্বয়ে সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এর আওতায় আসবে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করা, যাতে মন্ত্রণালয়সমূহ সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন, দক্ষতার সঙ্গে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত কর্মসম্পাদন মনিটরিংসহ সামগ্রিক বাজেট মনিটরিং করতে সক্ষম হয়। সেলক্ষ্যে প্রতিটি এমটিবিএফ মন্ত্রণালয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (Budget Management Committee-BMC) এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWC) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি ও গ্রুপ একই সঙ্গে বাজেট ও পরিকল্পনা কোষ হিসেবে কাজ করে।

১.৩৯ চলমান আর্থিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ MTBF পদ্ধতির আওতায় এসেছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরে নতুন আরো ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৩৩ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে MTBF পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে MTBF পদ্ধতির আওতায় আসবে। ইতোমধ্যে সরকার বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি চালু করেছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

১.৪০ রাজস্ব প্রশাসন ও নীতিতে কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে চালু করা হয়েছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। টাস্কফোর্স ইতোমধ্যে বেশকিছু সুপারিশসহ অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রদান করেছে। সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- শুল্ক ও কর বিভাগে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু
- অন-লাইনে কর রিটার্ণ দাখিল চালু করা

- ই-পেমেন্টের মাধ্যমে কর প্রদানের ব্যবস্থা করা
- কর প্রশাসনের পরিধি সম্প্রসারণ

কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে যা নিম্নরূপ-

- কর অব্যাহতি তালিকা ছোট করা
- ভ্যাট ও আয়করের পরিধি সম্প্রসারণ
- আয়কর ও ভ্যাটের জন্য একীভূত টিআইএন নম্বর (Taxpayer Indentification Number- TIN) চালু
- করারোপ পদ্ধতি আরো আধুনিকীকরণ ও যৌক্তিকিকরণ
- কর আহরণ পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ
- কর ফাঁকিবাজদের জন্য নূন্যতম সহনীয় (Zero tolerance) নীতি গ্রহণ
- কর হিসাব ও প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

১.৪১ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি সহজ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিদ্যমান সরকারি নিয়ম আরো সহজ করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মন্ত্রীকে ৭ কোটি টাকার কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়ার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া এডিপি বাস্তবায়নের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহে সভা করা শুরু করেছে। অধিকন্তু, বড় ১০টি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন তদারকির লক্ষ্যে IMED সচিবকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম বর্তমানে চলছে।